Sanatan Dharma

ভক্তকবি জয়দেব ও কেন্দুলী মেলা

বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে কেঁদুলি গ্রাম। কেন্দু বিল্বের (কেঁদুলি) ভক্ত কবি জয়দেব প্রতিবার মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে বর্ধমানের কাটোয়ায় যান গঙ্গাস্নান করতে। মকর সংক্রান্তি হচ্ছে মুক্তি যোগ, মোক্ষ লাভের যোগ। তাই হাজার হাজার মানুষ দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে আসেন গঙ্গাসাগরে। সাগর সঙ্গমে পবিত্র গঙ্গাস্নান করে তাঁরা জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি চান, মুক্ত হতে চান, কামনা করেন মোক্ষ। এ দৈবীযোগ।
কবি জয়দেব গঙ্গাস্নান করতে কাটোয়া যেতেন পায়ে হেঁটে। ওই দৈবীযোগে পুণ্য স্নান করা তাঁর জীবনে এক অপরিহার্য ঘটনা।
কিন্তু সেবার দেখা দিল বিঘ্ন। পরদিন মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি। কিন্তু তিনি গঙ্গাস্নান করতে যাবেন কী ভাবে ? পত্নী পদ্মাবতী সেবার কেঁদুলিতে নেই। জয়দেব পড়লেন মহা সঙ্কটে। বকিলে থেকেই তিনি ভাবছেন, কত মানুষ যাবেন পুণ্য তিথিতে গঙ্গাস্নান করতে। অথচ এ বছর তিনি যেতে পারবেন না। গৃহদেবতাকে একা রেখে তিনি যাবেনই বা কী ভাবে। এ সব চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মনের গভীরে দেখা দিল এক বিরাট শূন্যতা।
দুঃখে ক্ষোভে জর্জরিত জয়দেব রাত্রে কিছু খেতেও পারলেন না। একদিকে তাঁর গৃহদেবতা, অন্যদিকে গঙ্গাস্নান, কী করবেন, কিছুতেই ভেবে পেলেন না। তারপর এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখলেন, মা গঙ্গা স্বয়ং এসে তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়েছেন। তিনি জয়দেবকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘জয়দেব এত দুঃখ করছ কেন ? এত আক্ষেপেই বা করছ কেন ? কাল সকালে অজয় নদের কদম্বখণ্ডির ঘাটে আমি নিজেই আবির্ভূতা হব। যখন দেখবে অজয় নদের স্রোত উজানে বইছে, যখন দেখবে স্রোতের গতি উলটো মুখে, তখন সেই স্রোতে দেখবে এক পদ্মফুল ভাসছে, তখন বুঝবে আমি নিজেই তোমার কাছে এসেছি। অজয়ের বুকে গঙ্গা এসেছে, বুঝলে ?’
স্বপ্ন ভেঙে গেল এক লহমায়। জয়দেব বিছানায় উঠে বসলেন। ভাবলেন, এও কি সম্ভব ? মা গঙ্গা কি নিজেই আসবেন ? আর ঘুমতে পারলেন না তিনি। আকাশে তখন লক্ষ তারার মেলা। গোটা কেঁদুলি গ্রাম তখনও ঘুমিয়ে আছে। অন্ধকারের বুকে মাটি, নদী, আকাশ ডুবে আছে নিশ্চিন্তে, নীরবে। শুধু একজন চঞ্চল। তিনি কবি জয়দেব। প্রভাতের অপেক্ষায় তিনি অস্থির চিত্তে বসে আছেন। ঊষা লগ্নেই তিনি ছুটে গেলেন অজয় নদের তীরে। আশা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে তিনি কদম্বখণ্ডি ঘাটের জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছেন। এ কি, সত্যিই তো অজয় নদের উলটো স্রোতে ভেসে আসছে পদ্মফুল! ঘাটে তখন ভিড় জমে গেছে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সবাই দেখছেন সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।
জনজীবনে পড়ে গেল আলোড়ন। ভক্তের ডাকে দেবী গঙ্গা নিজে এসেছেন। মুহূর্তে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই পবিত্র জলধারায়। জয়দেবকে কেন্দ্র করে জমে উঠল আনন্দের হাট। কেন্দুবিল্ব হয়ে গেল তীর্থ সমান।
সেই থেকে শুরু।
মকর সংক্রান্তির পবিত্র তিথিতে অজয়ের জলে গঙ্গাস্নান করতে দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা প্রতি বছর আসতে পারেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন। আর সেই মিলনেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা। একটা করে ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে একটা করে মেলা গড়ে উঠেছে। তবে মজার কথা হচ্ছে, কেঁদুলি তো এখন আর কেঁদুলি নয়, জয়দেব। জয়দেবের জন্ম কোথায় ?

Published on: Jan, 11 2023 17:02

আমরা জানি কেন্দুবিল্ব, বীরভূমের কেঁদুলি, যেখানে মাটি-নদী আকাশে মিশে আছে জয়দেবের নাম। কিন্তু কোনও কোনও পণ্ডিত এ নিয়ে তর্ক তুলেছেন। তাঁরা কেউ বলছেন, জয়দেবের জন্ম ওড়িশায়, কেউ বলছেন বিহারে। এ নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আমরা জানি, কেন্দুবিল্ব গ্রামে গেলেই আমরা জয়দেবকে পেয়ে যাই। মেলার মাঠে পাই, নবরত্ন মন্দিরে পাই, বাউলের আসরে পাই, জনজীবনের মর্মমূলে পাই। কাজেই আমাদের কোনও তর্ক নেই। এখন আর একদিনের মেলা বসে না। মেলা চলে সপ্তাহ ধরে। মেলার সময় নবরত্ন মন্দিরের আশপাশে যাওয়ার উপায় থাকে না। সর্বত্র শুধু মানুষ আর মানুষ। মেলার প্রাণকেন্দ্রই হচ্ছে এই নবরত্ন মন্দির। আর পুণ্যার্থীর কাছে দুর্নিবার আকর্ষণও কদম্বখণ্ডির ঘাট। এই গ্রামে বসেই দুশ্চর কঠিন সাধনায় জয়দেব সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফুলেশ্বর ঘাটের কাছে এখনও পাথর আছে। সেই পাথরকে লোকে জয়দেবের সিদ্ধাসন বলেন।

আর ওই যে নবরত্ন মন্দির—যেটা মহাকালের ভ্রূকুটিতে আজ জরাজীর্ণ, অযত্নে করুণ চেহারা - সেই মন্দিরও গড়ে উঠেছে জয়দেবের কুঁড়েঘরের ওপরেই। সেখানেই তো ছিল গৃহদেবতার আসন। অজয়ের তীরেই নয় চূড়ো বিশিষ্ট মন্দির অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে তৈরি করে দিয়েছিলেন বর্ধমানের রাজমাতা ব্রজসুন্দরী দেবী। মহারাজ কীর্তি চাঁদের মা। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন জয়দেবের গৃহদেবতা রাধাশ্যাম। রাধাশ্যামের ঠিক বেদীর নীচেই বাঁদিকে জয়দেবের মূর্তি এবং ডানদিকে রয়েছে উপবিষ্টা পদ্মাবতীর মূর্তি। জয়দেবের মূল পুঁথিও পাণ্ডুলিপি আছে এখানে। জয়দেব বা কেঁদুলি—যে নামেই ডাকি না কেন, এই গ্রামের আসল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। এই গ্রামে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক। আর মেলার নাম যদিও জয়দেব মেলা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা বাউলদেরই মেলা। এখানে এই মেলা উপলক্ষে যত বাউল সমাগম হয় তত আর কোথাও হয় না। কাছেই শান্তিনিকেতন। অদূরেই দুর্গাপুর। মাঝখানে কেন্দুবিল্ব। বরং বলি জয়দেব। অথবা কেঁদুলি।

গীতগোবিন্দের কবি ‘প্রলয় পয়োধিজলে’ দাঁড়িয়ে যেন মহাকালের ভ্রূকুটিতে অগ্রাহ্য করে মানুষের প্রাণে এসে আসন করে নিয়েছেন। বন্যায় কেঁদুলি ডুবে যায়, প্রলয় জলে ভেঙে পড়ে ঘরবাড়ি, অজয় হয়ে ওঠে সর্বনাশা—কিন্তু তবুও জয়দেব অম্লান। বন্যার জল নেমে যায়, খরায় আগুন নিভে যায়, দুঃখের কালরাত্রি শেষ হয়, সুখের জীবন হয় ম্রিয়মান—তবু জয়দেব বেঁচে থাকেন। কবি জয়দেব, সাধক জয়দেব। কালজয়ী জয়দেব, মানুষ জয়দেব। মানুষের বড় আপনজন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এই বাংলায় তখন যেন রাজবংশের রাজত্ব। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ‘গৌড়েশ্বর’ উপাধি ধারণ করেন। সেন রাজারা ছিলেন শৈব, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫) হলেন বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী। তাঁরই রাজসভার প্রধান ঐশ্বর্য ছিলেন ‘গীতগোবিন্দের’ কবি জয়দেব। ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ এবং ‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ’ অনুসরণ করে কবি জয়দেব সেই প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। কেঁদুলির এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান জয়দেব। তাঁর পিতা মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁকে বললেন, ‘তোমার জন্য কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, সঙ্গীত বিদ্যা আয়ত্ত করেছ - এই তোমার সম্পদ। আমার বিশ্বাস সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমেই তুমি একদিন খ্যাতি অর্জন করবে।’

পিতাকে হারিয়ে জয়দেব হয়ে পড়লেন শোকাচ্ছন্ন, কোথাও যান না, কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না। এমন সময় ওই গ্রামেরই মোড়ল নিরঞ্জন চাটুজ্যে এসে তাঁর কাছে হাজির, বললেন, ‘শোন জয়দেব, তোমার বাবা আমার কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। সুদে আসলে টাকার অঙ্কটা নেহাত কম নয়। টাকাটা আমার এখনই অত্যন্ত প্রয়োজন।’

জয়দেবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। পিতার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে তিনি পিতৃঋণ শোধ করার জন্য তৎপর হলেন। শেষে পর্যন্ত গ্রামবাসীদের সাক্ষী রেখে তিনি পিতৃঋণ শোধ করার জন্য নিজের বসতবাটি নিরঞ্জন চাটুজ্যের নামে লিখে দিলেন। এবার তিনি

Published on: Jan, 11 2023 17:02

মুক্ত। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় এবং নিরালম্ব। সব সময় তিনি রাধাকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন। এক মধুর রসে তিনি যেন ভাসমান। এভাবেই একদিন এসে উপস্থিত হলেন জগন্নাথ ক্ষেত্র পুরীধামে।

পুরীতে এসে আপন ভাবে তন্ময় হয়ে এক সময় তিনি এসে উপস্থিত হলেন জগন্নাথ মন্দিরে। সেখানে এক রূপবতী কিশোরীর কণ্ঠে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত ভক্তি সঙ্গীত শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিশোরীর পিতামাতা এক ব্রাহ্মণ দম্পতি। তাঁরা জগন্নাথ দেবের বরে এই কন্যাকে পেয়েছেন, তাই কন্যাকে জগন্নাথ চরণে নিবেদন করতে এসেছেন। এই কিশোরীর নাম পদ্মাবতী। সাধক কবি পদ্মাবতীর গানে এবং রূপে মুগ্ধ। পদ্মাবতীও জয়দেবের আকর্ষণে বিহ্বল। এই যখন অবস্থা, তখন একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দর্শন পেলেন শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'জয়দেব তুমি নিজের গ্রামে ফিরে যাও, সেখানে বসে আমার প্রেমেলীলা বর্ণনা করে কাব্য রচনা করো।'

এই স্বপ্ন দর্শনের পর জয়দেব পড়লেন উভয় সঙ্কটে। একদিকে তাঁর ইষ্ট দেবতার আদেশ, অন্যদিকে পদ্মাবতীর আকর্ষণ। শেষে পর্যন্ত বৈষ্ণব সাধকের কাছে শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই হল গ্রহণীয়। পদ্মাবতীর বিরহ-যন্ত্রণাকে নিজের অন্তরে ধারণ করে তিনি চলে এলেন স্বগ্রাম কেঁদুলিতে। প্রেমের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবকে কৃপা করতেও দ্বিধা করলেন না। শেষে পর্যন্ত কবি জয়দেবের সঙ্গে মিলিন হল পদ্মাবতীর। তারপরই শুরু হল জয়দেবের অমর কাব্য 'গীতগোবিন্দ' রচনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমেলীলা অনুপম ভাষায় বর্ণনা করে জয়দেব চিরকালের জন্য জনচিত্তে স্থায়ী আসনের অধিকারী হলেন। 'গীতগোবিন্দ' রচনা প্রসঙ্গে এক দিব্য কাহিনী প্রচলিত।

শ্রীরাধা অভিমান করেছেন। কোনও অবস্থাতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলবেন না। কবি জয়দেব লিখলেন, 'স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনম্....,' কিন্তু তারপর ? আর যে কিছুই লিখতে পারছেন না তিনি। সেদিন কেটে গেল ভেবে ভেবে, পরেরদিন সকালেও সেই একই অবস্থা। দুপুর হয়ে গেল। তিনি তখনও ভাবছেন, শুধু ভাবছেন। পত্নী পদ্মাবতী আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, স্বামীকে এসে বললেন, 'বলো অনেক হয়ে গেছে। এখন যাও স্নান করে এসো। তারপর লিখবে।'

জয়দেব অগত্যা অজয় নদে স্নান করতে গেলেন। একটু পরেই পদ্মাবতী দেখলেন, জয়দেব ফিরে এসে আবার লিখতে বসছেন। এতে তিনি বিস্মিত হলেন, ভাবলেন কবি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কেন ? কোনও প্রশ্ন করার আগেই জয়দেব তাঁকে বললেন, 'স্নান করতেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পথে নতুন একটা পদের কথা মনে পড়ল। যদি পরে ভুলে যাই, তাই সেটা লিখে রাখার জন্য ফিরে এলাম। তুমি খাবারের ব্যবস্থা করো। আজ আর স্নান করব না।' পদ্মাবতী আর কথা না বাড়িয়ে স্বামীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে গেলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর জয়দেব গেলেন ঘরে বিশ্রাম করতে, আর পদ্মাবতী বসলেন খেতে। কিন্তু এ কি ? এ কেমন করে সম্ভব ? পদ্মাবতী খাবেন কি, তাঁর তখন দমবন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা।

তিনি দেখলেন, জয়দেব স্নান সেরে বাড়িতে ঢুকছেন। কোনওক্রমে তিনি বললেন, খেয়েদেয়ে তুমি শুতে গেলে, এর মধ্যে আবার স্নান করতে গেলে কখন ?

এবার হতবাক জয়দেব, পদ্মাবতী এ সব কী বলছে ? তখন পদ্মাবতী তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন নিজের পুঁথিটা দেখতে, যেটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি স্নান করতে গিয়েছিলেন। পুঁথির দিকে তাকিয়ে জয়দেবের চক্ষুস্থির। তাঁর লেখা পঙক্তির নীচেই লেখা রয়েছে, 'দেহি পদপল্লব মুদারম।'

তাহলে কে এসেছিলেন জয়দেবের বেশে ধারণ করে ?

জয়দেব বুঝলেন, ইনি তো স্বয়ং তাঁরই ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। সাধক কবির দুচোখে তখন ভক্তিভাবের অশ্রুধারা। পদ্মাবতী ভাবে বিহ্বল। এত সৌভাগ্য তাঁদের ? তাঁদের ঘরে এসেছিলেন তিনি, যাঁর পথ চেয়ে তাঁরা বসে আছেন□অথচ তাঁকে চিনতে পারলেন না। এভাবে তিনি কি আর কোনও দিনই দর্শন দেবেন ? ভক্ত ও সাধক কবি তাঁর অপরূপ সাধনায় এভাবেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে ভক্ত কবি জয়দেব শ্রীধাম বৃন্দাবনে

Published on: Jan, 11 2023 17:02

গিয়ে অবস্থান করেন। তিনি আর তাঁর সাধনক্ষেত্র এবং লীলাক্ষেত্র বীরভূমের কেঁদুলিতে ফিরে আসেননি। কিন্তু এখনও পৌষ সংক্রান্তির প্রচণ্ড শীতের রাত্রে অজয় নদের তীরে তীরে অসংখ্য ভক্ত ও বাউলের মধ্যে তিনি ফিরে আসেন। তিনি চিরকালের সাধক ও ভক্ত কবি।